সংবাদ

তারিখ ... 09 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

শিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা যায় আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল ব্রিটিশ পদ্ধতি। কারণ, ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশ এর শাসন ভার হাতে নিয়ে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভারত বর্ষসহ সারা পৃথিবীর মধ্যে বীজবপন করে দিয়ে গেছেন। ব্রিটিশরা এদেশে আসার আগে অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকে প্রায় মধ্য যুগ পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অনানুষ্ঠানিক। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করে গিয়েছে ইংরেজরা। ইংরেজরা যেমন সারা পৃথিবী দখল করে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তার করে গিয়েছে তেমনি ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রায় জীবন ও দর্শন ভারতীয় উপমহাদশে তথা সারা বিশ্বব্যাপী প্রচলন করেছেন। এভাবে কয়েক শতাব্দী ইংরেজ আধিপত্য বিশ্বব্যাপী শেষ হওয়ার পর আসলো আমেরিকান পদ্ধতি। এখন সারা বিশ্বব্যাপী চলছে আমেরিকান আধিপত্য। ব্রিটিশদের খবরদারি বর্তমান স্তিমিত হয়ে গেছে। এবার আসা যাক স্বাধীনতার আগে ও পরে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। দেশ স্বাধীনের আগে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশে তেমন বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি ছিল না যে কয়েকটি শিক্ষানীতি ছিল তা ছিল তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ঘেঁষা।

আমাদের সার্বিক উন্নতির জন্য, দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, জনসংখ্যাকে জন সম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষানীতিতে তেমন কোন স্পষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল না। বা ছিল দৈনন্দিন রুটিন ওয়ার্কের মতো এবং ব্রিটিশ শিক্ষানীতির ছায়াকপি। ব্রিটিশরা যেমন ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে বেকারের বোঝা বহন করাতো পাকিস্তান আমলের শিক্ষা পদ্ধতিতেও অলিখিতভাবে তা-ই-ছিল বলে প্রতীমান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে একজন বেকার বসে আছে। অথচ তার কোন ভিত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষা জানা নেই। বাসায় একটি বৈদ্যুতিক লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিভাবে মেরামত করতে হবে তা সে জানে না। দৌড়ে গিয়ে একজন ক্লাস ফাইভ পাস বা এইট পাস মিস্ত্রি নিয়ে এসেছে ঠিক করতে। সেই ফাইভ বা এইট পাস লোক এসে ঠিক করে দিয়ে গেছে বৈদ্যুতিক লাইন আর আমি বা আমরা এমএ পাস করে বেকার ঘরে বসে আছি। কারিগরি শিক্ষার তেমন কিছুই জানি না। এই রকম অন্তঃসারশূন্য লেখাপড়া দিয়ে চলছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে বর্তমানে এ ব্যবস্থার অবসান হচ্ছে বা হোক আমরা সবাই চাই। কথা হলো আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে থেকে যদি শুরু হতো সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ভিত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন তবে আমরা মনে হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অনেক পাল্টে যেতো। কথা হলো ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে আমাদের উচ্চ শিক্ষিত করে তুলেছে কিন্তু কোন বেকার সমস্যার সমাধান করে যেতে পারে নেই। এ কথা বলা যায় যে ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো এবং ভারতীয়দের বেকার বানানো। ভারতীয়দের শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা তাদের মুখ্য বিষয় ছিল না। তবে ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতির কায়দায় পাকিস্তান শিক্ষা পদ্ধতি চলছে প্রায় ২৪ বছর যা আমাদের রক্তে মাংসে মিশে আছে। দেশ স্বাধীনের পরও আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি চলেছে এভাবে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করে একটি সার্বজনীন শিক্ষা কমিশন তৈরি করেছিল কিন্তু তা আর আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর আবার পূর্বের নিয়মে চলছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। তখন কার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মুখস্থ নির্ভর। পাঠ্যবই ভালো করে পড়তে হবে তা থেকে প্রশ্ন আসবে এবং উত্তর লিখতে হবে। এভাবে চলেছে সত্তর এবং আশির দশক পর্যন্ত। তারপর নব্বই এর দশকে আসলো রচনামূলক পঞ্চাশ নম্বর এবং বহুনির্বাচনী পঞ্চাশ নম্বর। শিক্ষার্থীরা ঝুঁটতে শুরু করল বহুনির্বাচনী প্রশ্নের দিকে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু না পড়ে টিক চিহ্ন দিলে বা বৃত্ত ভরাট করলে অনেক সময় ১৫ বা ২০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যায়। অনেক শিক্ষার্থী আগের মত পাঠ্য বই ভালো করে না পড়ে বহুনির্বাচনী পড়া শুরু করে দিল। কমে আসলো শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই পড়ার অভ্যাস। শিক্ষার্থীর পড়া নির্ভর হয়ে গেল গাইড এবং নোট বই। এভাবে চলল কয়েক বছর। আসল সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি। মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে অচল। শিক্ষার্থীদের এমনভাবে তৈরি করা হবে তারা যেন মুখস্থগত বিদ্যার উপর নির্ভর না করে নিজেরা নিজেরা উত্তর তৈরি করে লিখতে পারে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি আসার পর ব্রিটিশ আমল থেকে যে প্রশ্নপত্রের কাঠামোতে পরীক্ষা হতো তা পরিবর্তন হয়ে গেল। লাখ, লাখ টাকা ব্যয় করে দেশের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে দিল। শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিবেন তা ভালো কথা। এখন প্রশ্ন হলো শিক্ষার্থীরা কতটুকু সৃজনশীল হয়ে লিখতে পারবে? কথায় বলে নিজে একলাইন লিখতে হলে অপরের লিখা ১০০ লাইন পড়তে হয়। তাহলে নিজের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এখন অনেক শিক্ষার্থী গাইড এবং নোট বই বেশি পড়ে। পাঠ্যবই কম পড়ে ফলে প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে হলে পাঠ্যবইটি ভালো করে পড়তে হবে তার পর রিলেটেড অন্য বই জার্নাল/ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়ে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করতে এমন কি বোর্ডের এস.এস.সি এবং জে.এস.সির খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে বলছে একটা আর শিক্ষার্থী উত্তর লিখেছে অন্যটা অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখে খাতা ভরপুর করে রেখেছে। সঠিক উত্তর না লিখার কারণে শিক্ষার্থী তখন ০ (শূণ্য) নম্বর পায়। ফলে, পরীক্ষায় পাসের হার কমে যায়। সৃজনশীল প্রশ্ন পত্রে একটি উদ্দীপক থাকে। উদ্দীপক টাকে ঘিরে চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রথম প্রশ্নটি জ্ঞানমূলক মার্ক ১ নম্বর, দ্বিতীয় প্রশ্নটি অনুধাবনমূলক মার্ক ২ নম্বর। তৃতীয় প্রশ্নটি প্রয়োগমূলক মার্ক ৩ নম্বর এবং চতুর্থ প্রশ্নটি উচ্চতর দক্ষতামূলক মার্ক ৪ নম্বর। প্রথম প্রশ্নটি বই থেকে সরাসরি আসে এবং পাঠ্যবইয়ে যে ভাবে উত্তর আছে ঠিক সেভাবে লিখতে হয়। সঠিক উত্তর হলে ১ নম্বর পায়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাঠ্য বইয়ের কথা নিজের ভাষায় লিখতে হয়। জ্ঞানের অংশের জন্য ১ নম্বর এবং ব্যাখ্যার অংশের জন্য ১ নম্বর পায়। তৃতীয় প্রশ্নটির তিনটি অংশ থাকে। প্রত্যেক অংশের জন্য এক নম্বর করে পায়। চতুর্থ প্রশ্নটিও ঠিক একই রকম চারটি অংশ থাকে। প্রত্যেক অংশের জন্য নির্ধারিত মার্ক আছে। উত্তর সঠিক হলে শিক্ষার্থীরা পুরো নম্বর পায়। এখন দেখা যায় শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল প্রশ্নের গ এবং ঘ এর প্রশ্ন অর্থাৎ ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে অনেক কিছুই বুঝে না উদ্দীপকটি বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে। যতার্থ উত্তর না লিখার কারণে ০(শূর্ণ্য) নম্বর পায় যা শিক্ষার্থীদের কোন কাজে আসে না। একটি স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী আছে। কেহ আছে অতিমেধাবী যার সংখ্যা খুবই কম। মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে ধরলে সর্বোচ্চ ১০% থেকে ১৫%। মধ্যম মানের এবং নিম্ন মধ্যম মানের শিক্ষার্থীই বেশি। তাদেরকে সৃজনশীল করে তুলতে হলে পাঠ্যবই এর জ্ঞান খুব ভালো ভাবে জানা থাকতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি ভালো করে পড়তে হবে। অতি মেধাবী ছেলে মেয়েরা তাদেরকে বেশী পড়াতে হয় না একটু টার্চ দিলেই তারা বুঝতে পারে এবং নিজে, নিজে পড়া তৈরি করে ফেলে। তাদের সৃজনশীল জ্ঞান ভালো। যে কোন প্রশ্ন তারা নিজেরা বুঝে শিক্ষক বা টিউটরের একটু সাহায্য নিয়েই সমাধান করতে পারে। সমস্যা হলো মধ্যম, নিম্ন মধ্যম এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে। মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল করে তুলতে হলে তাদের প্রচুর পড়া শোনা করতে হবে। পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান রপ্ত করে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। উপমা হিসেবে বলতে পারি পাঠ্য বইয়ে যে অংক গুলো আছে সেগুলো আগে ভালো ভাবে করে তার পর সৃজনশীল অংক করতে হবে। পাঠ্যবইয়ের অংক ভালোভাবে জানা না থাকলে সৃজনশীল এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নের দিকে দৌড়ালে কিছুই লাভ হবে না। এজন্য শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী পড়াশুনা করতে হবে।

এবার আসা যাক বাংলা ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিষয়ের কথা। অনেক শিক্ষার্থীকে দেখা যায় বাংলা ব্যাকরন এবং ইংরেজি ব্যাকরণ ভালো ভাবে না পড়ে কেবল মডেল প্রশ্ন পড়ে। এই যদি হয় পড়ার ধরন! তাহলে ঐ শিক্ষার্থী কিছুই পারবে না। বাংলা ব্যাকরণ এবং ইংরেজি ব্যাকরণগুলো অংকের সূত্রের মতো মুখস্থ করে সৃজনশীল এবং মডেল প্রশ্ন পড়তে হবে তাহলে ফল পাবে। নচেত কিছুই বুঝবে না। আগে ব্যাকরণের অংশও বহুনির্বাচনী অংশ ছিল। এখন ইংরেজি ব্যাকরণ ৩০ নম্বর লিখিত পাঠ্য করা হয়েছে। বাংলা ব্যাকরণ বহুনির্বাচনী রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ব্যাকরণে আগেকার শিক্ষার্থীর চেয়ে অনেক কাঁচা রয়ে গেছে। দেশ স্বাধীনের আগে ও পরে অর্থাৎ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন পদ্ধতি আসার আগে আমরা বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণগুলো ভালো করে পড়েছি। এখন অনেক শিক্ষার্থীকে যদি বলি সকল কারকে 'এ' (৭মী) শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও। তা বলা তো দূরের কথা তখন উত্তর দেয় এগুলো পরীক্ষায় আসে না। তখন আরো বাড়িয়ে বলে চারটি অপসান আছে বলুন আমি উত্তর বলি। মুখস্থবিদ্যাকে আমরা সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারবো না। যেখানে মুখস্থ করা দরকার তা মুখস্থ করতে হবে। তার পর সৃজনশীল হতে হবে। সৃজনশীল হতে গিয়ে আমি মুখস্থ বিদ্যাকে উপেক্ষা করতে পারিনা। এখন শ্রেণী কক্ষে পাঠদান পদ্ধতি অংশগ্রহণ মূলক। দলীয় কাজ, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, বাড়ির কাজ, মূল্যায়ন উপকরণের ব্যবহার' ইত্যাদি সব কিছু করতে হয়। তাই বলে কি আমরা সম্পূর্ণরূপে বক্তৃতা পদ্ধতি বাদ দিতে পেরেছি? শিক্ষার ইতিহাস পড়লে দেখা যায় বক্তৃতা পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ পর্যন্ত আছে যাহা আমাদের রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশে আছে। তবে বর্তমানে শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদান পদ্ধতি অনেক কমে আসছে। আধুনিক শিক্ষা উপকরণ এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতি এর বাস্তব উদাহরণ। যারা দুর্বল শিক্ষার্থী বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তাদেরকে অংক, ইংরেজি এবং বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোকে শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে হাতে কলমে বুঝিয়ে দিলে তাদের সৃজনশীল করে তোলা যাবে। এ জন্য অভিভাবকগণ বাসায় ছেলে মেয়েদেরকে বেশি তদারকি করতে হবে। কম্পিউটার, টিভি, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদির ব্যবহার থেকে দূরে রাখতে হবে। বই পড়ার প্রতি তাদেরকে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। আমার বিশ্বাস এবং ধারণা যে ছেলে মেয়েরা লেখা পড়ায় মনোযোগী, বই পড়ার আগ্রহ বেশি তাদের অবশ্যই সৃজনশীল জ্ঞান বেশি। যে কোন বিষয় তারা একটু পড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে তথ্য যেমন আমদেরকে দিয়েছে বেগ, উন্নতজীবন এবং পৃথিবীকে খুব সহজ করে দিয়েছে। তদরূপ তথ্যের অপব্যবহার আমাদের আবেগকে কেড়ে নিয়েছে। বর্তমান যুব সমাজের একটা অংশ তথ্যের অপব্যবহারে জড়িয়ে তাদের জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন তথ্যের অপব্যবহার করতে না পারে সে দিকে শিক্ষক, অভিভাবক সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। শিক্ষার কর্ণধার যারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেন, তাদের প্রতি আকুল আবেদন করছি বাংলা ২য় পত্রে অর্থাৎ বাংলা ব্যাকরণ আগের মতো ৩০ বা ৪০ নম্বর রচনা মূলক (লিখিত) করলে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের অংশ ভালোকরে পড়বে এবং শিখবে। পরীক্ষায় ব্যাকরণের অংশ রচনা মূলক না থাকলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ব্যাকরণের রচনামূলক অংশ না পড়ে শুধু বহুনির্বাচনী প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে, শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণে কাঁচা থেকে যায়। বাংলা ব্যাকরণে শিক্ষার্থীরা দুর্বল থাকলে তাদের ভাষা বলার ধরন ও দুর্বল হবে। অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলবে। এই জন্য শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক এবং হাইস্কুল থেকে ব্যাকরণের ভিত্তি মজবুত করে তুলতে হবে। বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছর কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের বয়স আড়াইশত বছর। আমদের মনে রাখা দরকার একমাত্র ব্যাকরনই ভাষাকে সহিশুদ্ধরূপ দিতে পারে।

তাই, আমার ব্যক্তিগত প্রস্তাব হলো আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে বাংলা ২য় পত্র এবং গণিতে বহুনির্বাচনী অংশ বাদ দিয়ে শুধু ১০০ নম্বরের রচনা মূলক অংশ করলে শিক্ষার্থীদের অনেক উপকার হবে। তাদের শিখন শেখানো জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে পরীক্ষায় ব্যাকরণের লিখিত অংশ থাকলে তারা আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে ব্যাকরণ পড়তে এবং শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক যখন ব্যাকরণ অংশ পড়াবে এবং বুঝাবে তখন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং লিখবে। এখন শ্রেণী কক্ষে আলাদা ভাবে ব্যাকরণ পড়াতে গেলে প্রায় শিক্ষার্থী পরীক্ষায় না আসার কারণে উষ্মা প্রকাশ করে। তখন শিক্ষক বাধ্য হয়ে বলতে হয় তোমরা ব্যাকারণের অংশটি বাসায় পড়ে নিও। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি ১ম পত্র একটি পাঠ্য বই আছে। এই বই থেকে কোন প্রশ্ন গ্রামারের অংশ না আসার কারণে বইটি ভালো করে পড়ে না। আমরা যখন স্কুলে পড়েছি তখন ইংরেজি ১ম পত্র বইটি ভালো করে পড়েছি। এই বই থেকে বড় এবং ছোট প্রশ্ন গ্রামারের অন্যান্য দিক আসতো। এখন শুধু দেখতে পাই শিক্ষার্থীরা মডেল প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেশি। পাঠ্য বই কম পড়তে দেখা যায়। এখন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল মূল্যায়ন হয় গ্রেডিং পদ্ধতি যাহা আন্তর্জাতিক মানের তা নিঃসন্দেহে ভালো কথা। কিন্তু আসল কথা হলো তারা সেভাবে জ্ঞান আহরণ করছে কিনা? এই গ্রেডিং পদ্ধতি নিয়ে কতটুকু মেধাবী হচ্ছে? আগে যখন ডিভিশন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল মূল্যায়ন করা হতো তখন একমাত্র অংকে বিষয়টি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আশি নম্বর পাওয়া ছিল কল্পনাতীত। দেশ স্বাধীনের আগে ও পরে যে ছাত্র গণিত বিষয়ে আশি নব্বর পেতো তাকে সবাই খুবই ভলো ছাত্র মনে করতো। গ্রামাঞ্চলে আশির দশক পর্যন্ত বি.এস.সি শিক্ষক পাওয়া খুব কঠিন ছিল। বিজ্ঞান অর্থাৎ পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান বিষয়গুলো শিক্ষার্থদের হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়ার মতো বিজ্ঞান শিক্ষক অর্থাৎ বি.এস.সি পাওয়া যেতো না। একমাত্র থানা সদরে অবস্থিত পাইলট হাইস্কুল ব্যতীত অন্যান্য স্কুলে তেমন বি.এস.সি শিক্ষক ছিল না। বাংলা, ইংরেজিসহ অন্যান্য বিষয়ে তখন শতকরা ৬০% নম্বর পাওয়া খুব কঠিন ছিল। এখন যেভাবে প্রতি বিষয়ে ৮০ নম্বর করে এ+ প্লাস নম্বর পায় তারা কি আগের শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী? যদি হয়ে থাকে তারা তো দেশের জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে দেখছি না। প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষা নিলে অনেক সময় তাদের মেধার মান নিয়ে প্রশ্ন থাকে। এখন কথার ছলে অনেকে বলে থাকে আগের পদ্ধতিই ভলো ছিল। চলো যাই আগের পথে। দেশের শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতির জন্য আমার ব্যক্তিগত মতামতগুলো সদয় বিবেচনা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি–

দেশের মেধা পাচার বন্ধ করতে হবে। তারা যেন শিক্ষকতা পেশায় আসে তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে।

দেশের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করে শিক্ষকদের উচ্চতর বেতন স্কেল দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের আবাসন সুবিধা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং রেশন সুবিধা প্রদান করে তাদের শিক্ষাদান কার্যক্রম সম্পূর্ণ শ্রেণীকক্ষভিত্তিক করতে হবে।

প্রাইভেট, কোচিং ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ না বলতে হবে। সরকারী বিধির বাহিরে যেন কেহ এ ব্যবস্থায় জড়িত না হতে পারে তা সর্বদা মনিটর করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রত্যেক শ্রেণী কক্ষ/শাখায় সর্বোচ্চ ৪০-৬০জন শিক্ষার্থী রেখে পাঠদান করতে হবে। শ্রেণী কক্ষেই তাদের সিলেবাস শেষ করে দিতে হবে। পাঠদান শেষে শিক্ষার্থী কতটুকু রপ্ত করলো তা দেখতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, পিতা/মাতা তাদেরকে সঠিক ভাবে টেক কেয়ার করতে হবে।

দুর্বল এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে যারা যে শ্রেণীর উপযুক্ত সে শ্রেণীতে পড়াতে হবে।

দেশে যত্রতত্র স্কুল, কলেজ, কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা না করে একটি সঠিক পরিসংখ্যান ভিত্তিক এবং বিধি মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার এবং খারাপ ফলাফলের জন্য জবাব দিহিতার ব্যবস্থা করে তার প্রতিকার করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত রচনামূলক/সৃজনশীল ৮০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনী লিখিত ২০ নম্বর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিবছর দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলে থানা, জেলা পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে শিক্ষায় সুবিধা অসুবিধার কথা শুনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা এবং মান উন্নত করতে হবে।

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষায় সর্বস্তরে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে পাঠ দান পদ্ধতি চালিয়ে যেতে হবে।

শ্রেণী শৃঙ্খলা এবং শ্রেণী ব্যবস্থাপনা রক্ষার জন্য দুষ্ট, অমনোযোগী, অবাধ্য শিক্ষার্থীদের প্রতি বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং শিক্ষামূলক শাস্তি বা অতিরিক্ত কাজের লোভ দিতে হবে।

শ্রেণীকক্ষে বেতের ব্যাবহার এবং সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক শাস্তি থেকে বিরত থাকতে হবে।

পরিশেষে, আমি একথা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে একটি আমূল পরিবর্তনের দরকার। যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে শিক্ষায় মান আধুনিক এবং উন্নত বিশ্বের মতো হবে। তবে শহর অঞ্চল দিয়ে সারা বাংলাদেশকে মূল্যায়ন করলে হবে না। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তাদের কথা শুনে শিক্ষা পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। রাজধানী শহরে এসি রুমে বসে শিক্ষা পদ্ধতি ঠিক করা যাবে না। গ্রামকে নিয়ে শহর আর গ্রামের মানুষ বাঁচলে শহর বাঁচবে। গ্রামের উপকার হলে সারা দেশের উন্নতি হবে। তাই গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ গুলির কথা চিন্তা করে একটি বাস্তবমুখী শিক্ষা পদ্ধতি তৈরি করতে হবে।

[লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক]